দ্বিতীয় ভাগ

(Part II)

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-পরিচয়

ভূমিকা

বাংলা-সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নাই যাহাতে রবীন্দ্রনাথ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাব্য-সাহিত্য, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, সাহিত্য-সমালোচনা ও অন্যান্য বিশুদ্ধ সাহিত্য বাদ দিয়াও শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিক আদর্শ, রাষ্ট্রনীতি, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় আদর্শ এবং ধর্মসাধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধাদি নিতান্ত সামান্য নহে। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নহে, একই বিষয় নানা বিভিন্ন সময়ে নানা বিভিন্ন প্রণালীতে আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়-বৈচিত্র্য ও আলোচনা-প্রণালীর বিভিন্নতায় রবীন্দ্র-সাহিত্য এরূপ সু-বিস্তৃত ও বহু-বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার সমগ্র রূপটিকে উপলব্ধি করা কঠিন।

১৩০৩ সালে কাব্য-গ্রন্থাবলীর একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—অনেক লেখা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকদের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে রচনাগুলি পরস্পরের সাহায্যে স্ফুটতর সম্পূর্ণতর হইয়া দেখা দেয়, লেখকের মর্মকথাটি পাঠকদের নিকট সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে। একবার লেখকের সমস্ত রচনার সহিত বৃহৎভাবে পরিচয় হইয়া গেলে, তখন প্রত্যেক স্বতন্ত্র লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিতে পারে। ১৩০৩ সালের সংগ্রহে কবিতাগুলি রচনার কালক্রমানুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণ বহুদিন হইল ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহার পরে গত ২৫ বৎসরের মধ্যে আর কোন প্রামাণ্য সংগ্রহ প্রকাশিত হইল না। কোন্ কবিতাটি কোন্ সময়ের লেখা তাহা জানিবার উপায় নাই; গ্রন্থগ্রন্থাবলীর প্রায় কোন লেখায় কোনপ্রকার তারিখ নাই। পৌর্বাপর্য্যের মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক সঙ্গতি ও পরিণতি আছে, অধিকাংশ স্থলেই তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করা সম্বন্ধে আরও একটি গুরুতর অন্তরায় ঘটিয়াছে। নিজের লেখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনরূপ দয়া মায়া নাই, অতি

নির্মমভাবে নিজের লেখা কাটিয়া কুটিয়া বাদ দিয়াছেন। শৈশবকালের অধিকাংশ লেখা, পুনর্মুদ্রিত হয় নাই[১]। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আঠারো বৎসর বয়সের পূর্বে লেখা প্রায় সাত হাজার লাইন কাব্য-সাহিত্য এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার মধ্যে মাত্র তিন চারিশত লাইন আজকালকার প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া যায়। এই বয়সের গদ্য-সাহিত্য একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে। কেবল শৈশব-রচনা নহে, প্রাপ্তবয়সের অনেক লেখা, বিশেষত গদ্যপ্রবন্ধ ও সমালোচনা, মাসিক পত্রিকার পাতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ লেখা সমস্ত সংগ্রহ করিলে বোধ হয় যাহা আছে তাহার উপর আরও এক-তৃতীয়াংশ হইতে পারে। রবীন্দ্রসাহিত্য সমগ্রভাবে আলোচনা করিতে হইলে এইসকল লেখা কোনমতেই বাদ দেওয়া চলে না।

রবীন্দ্রনাথের মতামত লইয়া আজকাল নানাপ্রকার বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতেছে। কবির লেখার সহিত সমগ্রভাবে পরিচয়ের অভাবই তাহার কারণ। যেসকল লেখা খণ্ড খণ্ড আকারে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়, সমগ্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলে তাহাদের পরস্পর-সঙ্গতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এইজন্য কিছুকাল হইল রবীন্দ্রসাহিত্য-সূচি (Bibliography) সংকলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই সূচি-সংকলন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে কালক্রমানুসারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। সর্বত্রই কবির নিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার চিন্তার ধারা কিরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার নিদর্শন দিবার চেষ্টা করিব। এখন মাত্র কবির ২২।২৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখা আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। আলোচনা যেমন অগ্রসর হইবে "রবীন্দ্র-পরিচয়ও" তেমনি বাহির হইতে

১। বাল্যরচনায় সাধারণতঃ কোন স্বাক্ষর নাই। এইরূপ স্থলে আমি সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছি। কবি যে-সকল লেখা নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু নিজের লেখা যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন তাহাও দেখিয়াছি। যে লেখা তাঁহার মনে নাই সেরূপ লেখা তাঁহার কোনও বইতে স্থান পাইয়াছে কিনা ইহাই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়াছি।

২। এই সূচি পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। সূচিতে কেবল প্রকাশিত লেখার তালিকা সংগ্রহ করিতেছি। এই কার্য্যে সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। অ-প্রকাশিত লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের মতামত সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও সমালোচনার একটি স্বতন্ত্র সূচি প্রস্তুত করাও আবশ্যক।

থাকিবে। এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে কার্য্য অগ্রসর হওয়ায় ইহাতে সমালোচনার ধারাবাহিক ঐক্যসূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা। তাই মনে রাখা আবশ্যক যে "রবীন্দ্র-পরিচয়" সাহিত্য সমালোচনা নহে, সমালোচনার পূর্বাভাষ মাত্র। কবির জীবন আলোচনাও বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, যদিও প্রসঙ্গ-ক্রমে জীবনের কিছু কিছু ঘটনার কথা আসিয়া পড়িবে। আপাততঃ, কবির জন্ম-তারিখটি ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, ইংরেজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে—স্মরণ রাখিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১। শৈশবকালে দেশ-বিদেশের প্রভাব

বর্তমান সংখ্যায় ১২৮৬ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ আঠারো বৎসর বয়সে বিলাত হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কবির মনের উপর দেশীয় ভাব ও বিদেশীয় প্রভাব কি কি ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে তাহার পরিচয় দিব। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন-মন্ত্র কবি বারংবার উচ্চারণ করিয়াছেন। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহাই রবীন্দ্রনাথের বাণী। শৈশবকালের কথা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আদর্শ সূচিত হইয়া উঠিয়াছিল, উত্তর কালে তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে মাত্র।

বাড়ীর আবহাওয়া

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বাড়ীর আবহাওয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থিরদীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়াছিল।..... আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনি ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

"আমাদের বাড়ীর সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন।

ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয়সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের গুণগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্পব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।"[১]

"ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।" বাড়ির বয়স্কদের কথা লিখিয়াছেন, "সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।.....বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা, যখন গণদাদার[২] রচিত "লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে" গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত।"[৩]

বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতেই বাংলাসাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত হয়।

"আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।"[৪] ....."ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল।.....বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই।.....প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চল শক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারিদিকে খুব করিয়া ইংরেজি পড়িবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা

১। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, ফাল্গুন, ৪১৬ পৃঃ।

২। ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা।

৩। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, মাঘ, ৩১৫ পৃঃ

৪। জীবন-স্মৃতি,—প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮, ৩১৪ পৃঃ।

শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার[১] উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।"[২]

সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতচর্চ্চাও চলিতেছিল। একেবারে গোড়া হইতেই সংস্কৃত কাব্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। তাঁহার বাল্যকালেই গীতগোবিন্দখানা হাতে পড়িয়াছিল।

"বাংলা ভাল জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিষটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।··· জয়দেব সম্পূর্ণও বুঝি নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।"[৩]

পণ্ডিতমহাশয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন।"[৪]

কুমারসম্ভবও এই রকম করিয়া পড়া হইল। এইরূপে খুব কম বয়সেই রবীন্দ্রনাথের মনের উপর সংস্কৃতসাহিত্যের একটি ছাপ পড়িয়া গেল।

গায়ত্রী গীতা উপনিষদ

রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের সময়ে গায়ত্রীমন্ত্র অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছিল।

"আমি বিশেষ যত্নে একমনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া

১। ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, অগ্রহায়ণ, ১০৮ পৃঃ।

৩। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী- ১৩১৮, অগ্রহায়ণ, ১১৩, ১১৪ পৃঃ।

৪। জীবন-স্মৃতি।

মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কি বুঝিতাম কি ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।.....তাই বলিতেছিলাম, গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধান মেজের উপর কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলি জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না "[১]

রবীন্দ্রনাথের গীতা-উপনিষদের সহিত অলক্ষ্যে পরিচয়ও আরম্ভ হইল।

"ভগবদ্গীতায় পিতার মনের মত শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার পরে এইসকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে পারিলাম।"[২]

বক্রোটায় "আমার শোবার ঘর ছিল একটি প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন—জানি না কত রাত্রে—দেখিতাম পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ সঞ্চারণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায়

বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।.....তাহার পর আর এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে নরঃ নরৌ নরাঃ মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময়টি নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড় দুঃখের এই উদ্বোধন।"

"সূর্য্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা অন্তে একবাটি

১। জীবন-স্মৃতি,—প্রবাসী, ১৩১৮, অগ্রহায়ণ, ১১৩, ১১৫ পৃঃ।

২। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, পৌষ, ২১০ পৃঃ।

দুধ খাওয়া শেষ করিতেন তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন।"[১]

এইরূপে প্রাচীন ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রভাব দশমবর্ষীয় বালকের মনে নিগূঢ়ভাবে কাজ করিতেছিল।[২]

বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয়

বাংলাভাষা চর্চ্চা ও বাংলা সাহিত্য আলোচনার সূত্রে বাংলাদেশের কথা রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতরে বসিয়া গিয়াছিল।

'আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুর্য্যে এককালে পাঁচালির দলের নায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত—আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম সে আর কি বলিব! শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত—পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম 'ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এস বন,' 'প্রাণ ত অস্ত হল আমার কমল-আঁখি', 'রাঙা জবায় কি শোভা পার পায়', 'কাতরে রেখ রাঙা পায়, মা অভয়ে', 'ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীর একান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে তবে' এই গানগুলিতে আমাদের আসর জমিয়া উঠিত।" [৩]

কিন্তু কেবল পাঁচালি নয়:—

"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে ত তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়দলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশী দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর এখন যে খুসী সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে

১। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১ , পৌষ, ২১২, ২১৩ পৃঃ।

২। কম বয়সের লেখায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

৩। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, মাঘ. ৩১৩ পৃঃ।

অনুরণিত করিয়া তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তির, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেক দিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।'[১]

এই সময়েই বাংলাদেশের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি লোভের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল।

"শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম।"[২]

স্বাদেশিকতার নেশা

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তখন স্বদেশ-প্রেমের ভরপুর নেশা। তাহার মধ্যে ছেলেমানুষি যে কিছু ছিল না তাহা নয়; বস্তুত বেশির ভাগই ছিল কল্পনা আর উত্তেজনা মিশাইয়া ক্ষ্যাপামির একটা-খেলা।

"জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কি করিতে যাইতেছি তাহা আমার আত্মীয়েরাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশী কিছু প্রয়োজন ছিল না।.... ...স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরী করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরা-কাঠির মধ্য দিয়া প্রচুর পরিমাণ তেজ প্রকাশ পায়, কিন্তু সে তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্স কয়েক দেশালাই তৈরী হইল। ভারত-

১। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, মাঘ, ৩:৫ পৃঃ।

২। জীবন স্মৃতি।

সন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চূলা ধরান চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জলন্ত অনুরাগ যদি তাহার জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।"[১]

"খবর পাওয়া গেল একটি কোনো অল্প বয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোন কাজের জিনিষ হইয়াছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারো ছিল না—কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় এক-খানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, আমাদের কলে এই গামছা টুকরা তৈরি হইয়াছে। বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য!—তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।"[২]

বাল্যস্মৃতি আলোচনা করিয়া প্রৌঢ়বয়স্ক কবি হাসিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষ্যাপামি তাঁহাকে কোনো বয়সেই পরিত্যাগ করে নাই। "চিরকুমার সভায়" ঠাট্টার সুরে এইসকল কল্পনার কথা কবি আবার শুনাইয়াছেন। দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি চিরদিন অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। ফল প্রায় সর্বত্রই সমান হইয়াছে, ভারতসন্তানের উৎসাহের নিদর্শন স্বরূপ নহে, খরচের পরিমাণ অনুপাতে তাঁহার চেষ্টা প্রায় সর্বত্রই বহুমূল্য হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার জ্যোতিদাদা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, সে কথা তাঁহার নিজের সম্বন্ধেও বলা যায়:—

"কিন্তু তবু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, এই সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন; আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবী অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার

১। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, ফাল্গুন, ৪১৬-১৪৮ পৃঃ।

২। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, ফাল্গুন, ৪১৮ পৃঃ।

নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন ; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্তী ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।"[১]

রচনা-প্রকাশ

যাহা হউক স্বদেশপ্রীতি আর বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের দ্বারা খুব কম বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন, এই সময়ের লেখায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

"আগমনী" কবিতাটিতে তিনি বাংলাদেশের ঘরের কথা, গিরিরাজ-দুহিতা উমার গৃহাগমনের কথা গাহিয়াছেন।[২] "ভারতী-বন্দনা"[৩] 'হর-হৃদে কালিকা'[৪] প্রভৃতি কবিতার মধ্যে দেশীয় ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভানুসিংহের কবিতা[৫] সমস্তই বৈষ্ণবপদাবলী অনুসরণ করিয়া রচিত।

"বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য"

প্রথম বর্ষ ভারতীতে এই নামে একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ষোল বৎসর। জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে এই প্রথম প্রবন্ধেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের কথা দেখিতে পাই।

"ইউরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, পূর্বদেশীয় গম্ভীর ভাব ও পশ্চিম-দেশীয় তৎপর ভাব, ইউরোপের অর্জন-শীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণ-শীলতা, পূর্বদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্য্যকরী

১। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৯, শ্রাবণ, ৩৫১ পৃঃ।

২। ভারতী, ১ম বর্ষ, ১৮৮৪।

৩। ভারতী, ৪র্থ বর্ষ, ১২৮৭।

৪। ভারতী, ১ম—৪র্থ বর্ষ, ১২৮৪-১২৮৭।

৫। ভারতী, ১ম বর্ষ, ১২৮৪, মাঘ, ৩০৫-৩০৬ পৃঃ।

বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কি পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে!·····ইউরোপের শিল্পবিজ্ঞান ও আমাদের দর্শন উভয়ে মিলিয়া আমাদের জ্ঞানের কি উন্নতি হইবে! এইসকল কল্পনা করিলে আমরা ভবিষ্যতের সুদূর সীমায় বঙ্গদেশীয় অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই।"[১]

বিশ্বভারতীর পূর্বাভাস

ভারতবর্ষীয় সভ্যতার আদর্শ যে দিগ্বিজয় বা সাম্রাজ্য বিস্তার নহে, তাহা যে জ্ঞানবিজ্ঞান ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার এবং মঙ্গল আদর্শ স্থাপনা করা। তাহা তিনি তখনই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন।

"মনে হয়, ঐ সভ্যতার উচ্চ শিখরে থাকিয়া যখন পৃথিবীর কোনো অধীনতার ক্লিষ্ট অত্যাচারে নিপীড়িত জাতির কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইব, তখন, স্বাধীনতা ও সাম্যের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তাহাদের অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দিব। আমরা নিজে শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্যন্ত অধীনভাবে অন্ধকার-কারাগৃহে অশ্রু মোচন করিয়া আসিয়াছি, আমরা সেই কাতর জাতির মর্মের বেদনা যেমন বুঝিব তেমন কে বুঝিবে? অসভ্যতার অন্ধকারে পৃথিবীর যেসকল দেশ নিদ্রিত আছে, তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে আমরা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিব। বিজ্ঞান দর্শন কাব্য পড়িবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক আমাদের ভাষা শিক্ষা করিবে! আমাদের দেশ হইতে জ্ঞান উপার্জন করিতে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বিদেশের লোকে পূর্ণ হইবে।"[২]

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিতেন না যে তাঁহার বাল্যকালের কল্পনা ক্রমে বিশ্বভারতী রূপ ধারণ করিয়া সত্য হইয়া উঠিবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব

অনুকরণকে তিনি চিরদিন ঘৃণা করিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্যসভ্যতার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বিদেশী বলিয়া কাহাকেও তিনি দূরে ঠেলিয়া ফেলেন নাই—বিদেশী অধ্যাপক ও পরদেশী বন্ধুর প্রভাব তাঁহার জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। মানুষের

১। "কাল্পনিক ও বাস্তবিক"—ভারতী, ১২৪৫, ভাদ্র, ২১৬ পৃঃ।

২। ঐ, ২১৮ পৃঃ। ঐ, ২১৯ পৃঃ।

সহিত মানুষের সম্বন্ধকেই তিনি বড় বলিয়া জানিয়াছেন, সেখানে দেশী বিলাতি ভাব কখনো আনেন নাই।

বিদেশী অধ্যাপক

বিদেশী অধ্যাপকদের একটি পবিত্রস্মৃতি বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সেণ্টজেবিয়ার্সের কথা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

"সমস্ত অধ্যাপকদের জীবনের আদর্শকে উচ্চ করিয়া ধরিয়া মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে এমন একটি স্মৃতি আমার আছে। ফাদার ডিপেনারাণ্ডার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশী ছিল না···তিনি জাতিতে স্পেনীয় ছিলেন। ইংরাজি উচ্চারণে তাঁহার যথেষ্ট বাধা ছিল। বোধ করি সেই কারণেই তাঁহার ক্লাসের শিক্ষায় ছাত্রগণ যথেষ্ট মনোযোগ করিত না। আমার বোধ হইত ছাত্রদের সেই ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেন, কিন্তু নম্রভাবে প্রতিদিন সহ্য করিয়া লইতেন। আমি জানি না কেন, তাঁহার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইত। তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ছিল না, কিন্তু আমার কাছে তাহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন—অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় শুদ্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আধঘণ্টা আমাদের কাপি লিখিবার সময় ছিল—আমি তখন কলম হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহা-তাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার ডিপেনেরাণ্ডা এই ক্লাসের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন। বোধ করি দুই তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে না। এক সময়ে আমার পিছনে থামিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন, এবং অত্যন্ত সস্নেহস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, টাগোর, তোমার কি শরীর ভাল নাই?—বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার সেই প্রশ্নটি ভুলি নাই।···আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম—আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেব-মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।"[১]

১। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮, ৩১৪ পৃঃ।

এর পরেও এই রকম আরো কয়েকজন বিদেশী অধ্যাপকের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন যাঁহাদের জীবনের পবিত্রতায় বিদেশী শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের নিকট শ্রদ্ধার জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশী শিক্ষাকে হৃদয়ের সম্বন্ধের মধ্য দিয়া তিনি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সে শিক্ষ তাঁহার মনকে একটি বৃহৎ মুক্তির ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছে, কেবল স্তূপাকার উপকরণের বোঝা হইয়া উঠে নাই। তাঁহার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিয়াছেন যে বিদেশী শিক্ষাকে সার্থক করিতে হইলে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করা আবশ্যক। মনের মিলন না ঘটিলে বিদেশী অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করা যে নিতান্তই বিড়ম্বনা একথা তিনি বারংবার বলিয়াছেন। বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে হৃদয়ের যোগাযোগ নাই এইজন্য তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধী। বিদেশী বলিয়া নহে—হৃদয়ের সম্বন্ধ নাই বলিয়া তিনি আপত্তি করিয়াছেন।

ইংরেজি ভাষা চর্চা

রবীন্দ্রনাথের অল্প অল্প করিয়া ইংরেজি ভাষা চর্চা আরম্ভ হইল। ভাষা অপেক্ষা সাহিত্যর প্রতি অনুরাগই বেশি ছিল।

"আহমদাবাদে একটি বড় ঘরের দেয়ালের থাপে থাপে মেজদাদার[১] বইগুলি সাজান ছিল। তাহার মধ্যে, বড় বড় অক্ষরে ছাপা, অনেক ছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল।··· আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না, তাহা নহে—কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কূজনের মতই ছিল।"[২]

কিন্তু ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য পরিশ্রমের ত্রুটি ছিল না।

"ইংরেজিতে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন ডিক্সনারী লইয়া নানা ইংরেজী বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ একরকম চলিয়া যাইত।"[৩]

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইনি তখন আমেদাবাদের জজ ছিলেন।

২। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, চৈত্র, ৫৩৩ পৃঃ।

৩। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, চৈত্র, ৫৩৩ পৃঃ।

য়ুরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা চলিতে লাগিল। "স্যাক্সন জাতি ও অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্সন সাহিত্য" "পিত্রার্কা ও লরা" "দান্তে ও তাঁহার কাব্য" "গেটে"[১], "নর্ম্যান্ জাতি ও অ্যাঙ্গ্‌লো-নর্ম্যান্ সাহিত্য" "চ্যাটার্টন বালক-কবি"[২] প্রভৃতি প্রবন্ধ তাহার নিদর্শন।

জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার ফলেই হউক অথবা নিজের ভিতর হইতেই হউক, ষোল বৎসর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে,

"যতদিন ভাষার উন্নতি না হয়, ততদিন জাতির উন্নতি হয় না, অথবা জাতির উন্নতির চিহ্নই ভাষায় উন্নতি।"[৩]

বিলাত যাত্রা

সতেরো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বার বিলাতযাত্রা করেন। বিলাত হইতে প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে যে পত্রগুলি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র"[৪] নামে প্রকাশিত হয়। এই পত্রগুলিতে ইংলণ্ডে গিয়া কিরূপে তাঁহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।

"এই ত প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। জানোই ত আমি কি রকম কাল্পনিক, মনে করেছিলেম, য়ুরোপে পৌঁছিয়েই কি অপূর্ব দৃশ্য চোখের সুমুখে খুলে যাবে, সে যে কি, তা' কল্পনাতেই থাকে, কথায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, কল্পনার সঙ্গে সত্য-রাজ্যের প্রায় বনে না। কোনো নূতন দেশে আস্‌বার আগেই আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, এসে আর তা' নূতন বোলে মনেই হয় না; ....ইউরোপে আমার তেমন নূতন মনে হয়নি শুনে সকলেই অবাক।"[৫]

বিলাতি সমাজ

বাহিরের চাকচিক্যে রবীন্দ্রনাথের মন ভোলে নাই। বিলাতে পৌঁছিয়া নানা বিষয়ে তিনি প্রথমে ভারি নিরাশ হইয়াছিলেন।

১। ভারতী, ২য় বর্ষ, ১২৮৫।

২। ভারতী, ৩য় বর্ষ, ১২৮৬।

৩। ভারতী, ১ম বর্ষ, মাঘ ১২৮৪, ৩০৭ পৃঃ।

৪। ভারতী, ৩য়-৪র্থ বর্ষ, ১২৮৬, ১২৮৭। পুস্তাকাগারে :— ১৮০৩ শক।

৫। য়ুরোপযাত্রী, (১ম পত্র, ১৯ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৬, জ্যৈষ্ঠ, ৯০ পৃঃ।

"আমি ইংলণ্ড দ্বীপটাকে এত ছোট ও ইংলণ্ডের অধিবাসীদের এমন বিদ্যালোচনাশীল মনে করেছিলেম যে, ইংলণ্ডে আসবার আগে আমি আশা করেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্রদ্বীপের একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত বুঝি টেনিসনের বীণাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হোচ্চে ; মনে করেছিলেম, এই দুইহস্ত-পরিমিত ভূমির যেখানে থাকি না কেন, গ্লাডষ্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্‌স্‌মূলারের বেদব্যাখ্যা, টিণ্ডালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুনতে পাব ; মনে করেছিলেম, যেখানে যাই না কেন, intellectual আমোদ নিয়েই আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝি উন্মত্ত ; কিন্তু তাতে আমি ভারি নিরাশ হোয়েছি।"[১]

বাইরে থেকে ফ্যাশানেব্‌ল্‌ মেয়েদের দেখে তাদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা হয় নি।

এদেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটারদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক ও অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে flirt করে, এই ত আমার অভিজ্ঞতা।"[২]

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে কিছুদিন থাকার পর অরেকটু তলাইয়া দেখিতে দেখিতে ভালদিকটাও চোখে পড়িতে আরম্ভ করিল। অষ্টম পত্রে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে আগের চিঠিতে,

"কেবল একশ্রেণীর মেয়েদের একটা ভাগ দেখিয়েছিলুম মাত্র ; তাঁরা হোচ্চেন Fashionable মেয়ে। Fashionable মেয়ে ছাড়া বিলাতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে বিলাতে সংসার চলত না।"[৩]

মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ সমস্ত দেখেন, সংসার চালানোর ব্যবস্থা করেন।

"এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গিন্নিরা এই রকম শাদাসিদে, যদিও তাঁরা ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখেননি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার ; এদেশে কথায় বার্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে

১। য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র—(২য় পত্র—২২-২৭ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬ আষাঢ়, ১১৯ পৃঃ।

২। ঐ (২ পত্র, ২৮-২৯ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, আষাঢ়, ১২০ পৃঃ।

৩। ঐ (৮ম পত্র, ৭৮, ১৭৪ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৬, কার্তিক, ২৯৬ পৃঃ।

বন্ধ নন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তা কন, আত্মীয়সভায় একটা কোনো বিষয় নিয়ে চর্চা হলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বোলতে পারেন।"[১]

স্ত্রীস্বাধীনতা

"মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত কোরে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। আমরা অনেক জিনিষ না দেখ্‌লে দূর থেকে কল্পনা কোর্তে পারিনে। এখানে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এয়েছেন, সর্বপ্রথমেই তাঁদের চোখে কি ঠেকেছে?—এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতি সাধনে মহিলাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা। যাঁরা স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এখানে এসে নিশ্চয়ই তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হোয়েছে।"[২]

দেশীয় সমাজ

কেবল স্ত্রীস্বাধীনতা নহে, বিলাতে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সর্বত্রই যে স্বাধীনভাবের স্ফূর্তি দেখা যায় সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি দেশীয় সমাজ সম্বন্ধে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন :—

"এই রকম ছেলে-বেলা থেকে গুরুভারে অবসন্ন হোয়ে একটি মুমূর্ষু জাতি তৈরি হোচ্চে। ছেলে-বেলা থেকে বলের অন্ধ দাসত্ব কোরে আস্‌চে সুতরাং বড় হোলে সে অবস্থা তার নতুন বা অরুচি জনক বোলে ঠেকে না, তার কাছে এ অবস্থা স্বাভাবিক হোয়ে গেছে। আজ্ঞা পালন কোরে কোরে তার এমন অবস্থা হোয়ে যায়, যে, আজ্ঞা কোরে বল্লেই তবে সে একটা কথা গ্রাহ্য করে, বুঝিয়ে বোলতে গেলেই তবে বেঁকে দাঁড়ায়।"[৩]

"আমরা ছেলেবেলা থেকে আমাদের গুরুলোকদের অভ্রান্তবুদ্ধির উপর নির্ভর কোরচি, আমরা যেখানেই আমাদের নিজের মত খাটাতে গিয়েছি সেইখেনেই তাঁরা ছেলেমানুষ বোলে আমাদের চুপ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো যুক্তি দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করেননি। ছেলেমানুষের কাছে যুক্তি

১। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (৮ম পত্র, ১৭৮ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৬, কার্তিক, ৩০১ পৃঃ।

২। ঐ (৬ষ্ঠ পত্র, ১২৯ পৃঃ), ভারতী, ১২৮৬, অগ্রহায়ণ, ৩৫৮ পৃঃ।

৩। ঐ (৯ম পত্র, ২০৪ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, পৌষ, ৪০০ পৃঃ।

প্রয়োগ করা তাঁরা বৃথা পরিশ্রম মনে করেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও এককালে তাই মনে কোর্তেন, তাঁরা শ্রমসংক্ষেপ করবার জন্য সত্যকথাগুলিও মিথ্যার আকারে প্রচার কোরেচেন, ও মুক্তির বদলে বিভীষিকা দেখিয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছেন।.....যখন গুরু-লোকেরা আপনার ইচ্ছা ও সংস্কার, এমন কি কুসংস্কারের বিরোধী হোলো বলে ছোটর প্রত্যেক ইচ্ছা অবিচারে দলন না কোর্বেন, তখন অনেক উপকার হবে। আমাদের দেশের অশুভের মূল ঐখান থেকে অনেকটা পোষণ পাচ্চে। এখানকার তুলনায় আমি সেইটি ভাল কোরে বুঝতে পেরেচি।"[১]

সামাজিক স্বাধীনতা

রবীন্দ্রনাথ বিলাতের সমাজের কথা বলিয়াছেন :—

"এখানকার ছেলেদের একরকম স্বাধীন ও পৌরুষের ভাব দেখলে অবাক হোয়ে যেতে হয়। তার প্রধান কারণ এখানকার গুরুলোকেরা তাদের প্রতিপদে বাধা দেয় না, আর অনেকটা সমানভাবে রাখে।.....এমন স্বাধীনভাব বর্তমান যে, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে সে রকম আকাশ-পাতাল সম্পর্ক নেই। এখানে চাকরদের মধ্যে দাসত্বের ভাব যে কত কম, তা' হয় ত তুমি না দেখলে ভাল কোরে বুঝতে পারবে না।.....এখানকার পরিবারে স্বাধীনতা মূর্তিমান, কেউ কাউকে প্রভুভাবে আজ্ঞা করে না, ও কাউকে অন্ধ আজ্ঞা পালন কোর্তে হয় না। এমন না হোলে একটা জাতির মধ্যে এত স্বাধীনভাব কোথা থেকে আসবে? কিম্বা হয়ত আমি উলটো বলচি, একটা জাতির হৃদয়ে স্বভাবতঃ এতটা স্বাধীনভাব না থাকলে এমন কি কোরে হবে? যাদের হৃদয়ে স্বাধীনভাব নেই, তারা যেমন অম্লানবদনে নিজের গলায় দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে পারে, একটু অবসর পেলেই পরের গলায়ও তেমনি অকাতরে দাসত্বের রজ্জুবাঁধতে ভালবাসে। আমাদের সমাজের আপাদমস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ।"[২]

দেশীয় ভাব

বিলাতের সামাজিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশীয় আচার ব্যবহার ও দেশীয় প্রথার প্রতি

১। য়ুরোপ-প্রবাসী (৯ম পত্র, ২০৩ পৃঃ) ভারতী ১২৮৮, পৌষ, ৩৯৭ পৃঃ।

২। য়ুরোপ-প্রবাসী (৯ম পত্র, ২০৬-২০৯ পৃঃ) ভারতী ১২৮৮, পৌষ, ৪০৭-৪০৬ পৃঃ।

অনুরাগ কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। বিলাতে বাল্যকালেও তিনি বরাবর দেশী কাপড় পরিয়াছেন। এর জন্য যথেষ্ট হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপও সহ্য করিতে হইয়াছে।

"আমাদের দিশি কাপড় দেখে, রাস্তার এক এক জন সত্যি সত্যি হেসে উঠে, এক এক জন এত আশ্চর্য হয়ে যায় যে তাদের আর হাস্‌বার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক আমাদের জন্যে গাড়ি চাপা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গিয়েছে, তারা আমাদের দিকে এত হাঁ কোরে চেয়ে থাকে যে পেছনে গাড়ি আস্‌চে হুঁস্ নেই।.....ইস্কুলের ছোকরা এক একজন আমাদের মুখের উপর হেসে উঠে, এক একজন চেঁচাতে থাকে—"Jack, look at the blackies!" কিন্তু আমি সেসব কিছুই গ্রাহ্য করি নি, আমার এক তিলও লজ্জা করে না।"[১]

ইঙ্গ-বঙ্গ-সংবাদ

রবীন্দ্রনাথ সাহেবিয়ানাকে চিরদিনই ঘৃণা করিয়াছেন। বিলাতি চালচলন হাবভাবের নকল তিনি কোনোদিনই সহ্য করিতে পারেন নাই। য়ুরোপ-প্রবাসীর পঞ্চম পত্রে ইঙ্গ-বঙ্গ-নামক অদ্ভুত নূতন জীবের বিস্তারিত বর্ণনা যখন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতেরো বৎসর।

"ইংরেজ ও আঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান যেমন দুই স্বতন্ত্র জাত, বাঙ্গালী ও ইঙ্গ-বঙ্গও তেমনি দুই স্বতন্ত্র জীব। এইজন্য ইঙ্গ-বঙ্গদের বিষয়ে তোমাদের যত নতুন খবর দিতে পারব, এমন বিলেতের আর খুব কম জিনিষের উপর পারব।" এই ইঙ্গবঙ্গদের "দেশের আর কিছুই ভাল লাগে না, নানা প্রকার খুঁটিনাটি ধোর্‌তে প্রবৃত্তি হয়। তার পরে যখন বিবিদের সমাজে মিশতে আরম্ভ করে, তখন দেশের উপর ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে যায়।"[২]

ইঙ্গ-বঙ্গ ভদ্রতা

"ইঙ্গবঙ্গদের ভাল করে চিন্‌তে গেলে তাঁদের তিন রকম অবস্থায় দেখ্‌তে হয়। তাঁরা ইংরেজদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন, বাঙ্গালীদের সুমুখে কি

১। য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র (৩য় পত্র, ৫১ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬ শ্রাবণ, ১৬৭ পৃঃ।

২। য়ুরোপপ্রবাসী (৫ম পত্র, ৭৪ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, ভাদ্র, ২২২ পৃঃ।

রকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গ-বঙ্গদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন।...একটি ইঙ্গ-বঙ্গকে একজন ইংরেজের সুমুখে দেখ, তাঁকে দেখ্‌লে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে। কেমন নম্র ও বিনীত ভাব! ভদ্রতার ভারে প্রতিকথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পোড়্‌ছে, মৃদু ধীরস্বরে কথাগুলি বেরোচ্ছে। ...তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হোতে থাকে। কিন্তু তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখ, দেখ্‌বে, তিনিই একজন মহা তেরিয়া মেজাজের লোক।"[১]

"...ব্যক্তি-বিশেষের জন্যে তিনি তাঁর ভদ্রতার বিশেষ মাত্রা স্থির কোরে রেখেছেন। ইংলণ্ডে যারা জন্মেছে, তাদের জন্যে বড় চামচের এক চামচ,—ইংলণ্ডে যারা পাঁচ বৎসর আছে, তাদের জন্য মাঝারী চামচের এক চামচ,—ও ইংলণ্ডে যারা মূলে যায় নি, তাদের জন্য ফোঁটা দুই তিন ব্যবস্থা! ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের ন্যূনাধিক্য নিয়ে তাঁদের ভদ্রতার ন্যূনাধিক্য হয়। তাঁদের মাপাজোকা ভদ্রতার পায়ে গড় করি, তাঁদের Principle-এর পায়ে গড় করি।"[২]

বিলাতি কুসংস্কার

"যে ইঙ্গ-বঙ্গগণ আমাদের দেশীয়-সমাজে নানাপ্রকার কুসংস্কার আছে বোলে নাসাকুঞ্চিত করেন, বিলেত থেকে তাঁরা তাঁদের কোটের ও প্যাণ্টলুনের পকেট পুরে রাশি রাশি কুসংস্কার নিয়ে যান।... সে দিন এক জায়গায় আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের কথা হোচ্ছিল, বাপ-মার মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্যি করি, বেশভূষা করিনে, ইত্যাদি—শুনে একজন ইঙ্গ-বঙ্গ যুবক অধীরভাবে আমাকে বোলে উঠ্‌লেন, যে, "আপনি অবিশ্যি, মশায়, এসকল অনুষ্ঠান ভাল বলেন না।" আমি বল্লেম, "কেন নয়? মৃত আত্মীয়ের জন্য শোক প্রকাশ করাতে আমি ত কোনো দোষ দেখিনে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে শোক প্রকাশ করবার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। ইংরেজেরা কাল কাপড় পোরে শোক প্রকাশ করে বোলে শাদা কাপড় পোরে শোক প্রকাশ করা অসভ্যতার লক্ষণ মনে কোরো না; আমি দেখ্‌ছি ইংরেজরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে হবিষ্যান্ন খেত, আর আমাদের

১। য়ুরোপযাত্রী (৫ম পত্র, ৭৮-৮০ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৬, আশ্বিন, ২৪২-২৫০ পৃঃ।

২। য়ুরোপপ্রবাসী (৫ম পত্র ৮০ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৮, আশ্বিন, ২৫০ পৃঃ।

লোকেরা না খেত, তা হলে হবিষ্যান্ন খায় না বোলে আমাদের দেশের লোকের উপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হোত, ও মনে কোর্‌তে হবিষ্যান্ন খায় না বোলেই আমাদের দেশের এই দুর্দশা, আর হবিষ্যান্ন খেতে আরম্ভ কোর্‌লেই আমাদের দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠ্‌তে পারবে। এর চেয়ে কুসংস্কার আর কি হোতে পারে?"[১]

"··কুসংস্কার মানুষকে কতদূর অন্ধ কোরে তোলে, তা বাঙ্গালার অশিক্ষিত কৃষীদের মধ্যে অনুসন্ধান কর্‌বার আবশ্যক করে না, ঘোরতর সভ্যতাভিমানী বিলিতি বাঙ্গালীদের মধ্যে তা দেখ্‌তে পাবে। হঠাৎ বিলেতের আলো লেগে তাঁদের চোখ একেবারে অন্ধ হোয়ে যায়। কিন্তু বিলেতের কি দেখে তাঁরা মুগ্ধ হোয়ে পড়েন?···কেবল বাহ্য চাকচিক্য! এ বিষয়ে তাঁরা ঠিক বালকের মত। একখানি বই দেখ্‌লে তাঁরা তার সোনার জলের চিত্র করা বাঁধান মলাট দেখে হাঁ করে থাকেন, তার ভিতরে কি লেখা আছে, তার বড় খবর রাখেন না!"[২]

ইঙ্গ-বঙ্গ সাহেবিয়ানা

"আমি আগেই বলেছি বিলেতের কতকগুলি বাহ্যিক ছোটোখাটো বিষয় বাঙ্গালীর চোখে পড়ে। তাঁরা যখন সাহেব হোতে যান, তখন সাহেবদের ছোটখাট আচারগুলি নকল কোর্তে যান।"[৩]

"·····বাঙ্গালীরা ইংরেজদের কাছে যত আপনাদের দেশের লোকের ও আচার-ব্যবহারের নিন্দে করেন, এমন একজন ঘোর ভারতদ্বেষী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছে কোরে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানা প্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে পরিহাস করেন।·····তিনি বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত অসত্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন; তিনি ভারতবর্ষীদের 'নেটিব নেটিব' কোরে সম্বোধন করেন।·····সাহেব-সাজা বাঙ্গালীদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙ্গালী বলে ধরা পড়েন।·····তাঁর মা-বাপেরা যে বাঙ্গালী ও সে হতভাগ্যেরা যে বাঙ্গালায় কথা কয় এতে তিনি নিতান্ত লজ্জিত আছেন।

১। য়ুরোপ-প্রবাসী (৫ম পত্র, ৮৩ পৃঃ) ভারতী, ১২৮৮, আশ্বিন, ২৫১ পৃঃ।

২। য়ুরোপ-প্রবাসী (৫ম পত্র, ৮৫ পৃঃ) ভারতী ১২৮৮, আশ্বিন, ২৫২ পৃঃ।

৩। য়ুরোপ-প্রবাসী (৫ম পত্র, ৮৯ পৃঃ) ভারতী ১২৮৮, আশ্বিন, ২৫৫ পৃঃ।

আহা! যদি টেম্‌সের জলে স্নান করলে রংটা বদ্‌লাতো, তবে কি সুবিধা হোত!"[১]

ইঙ্গ-বঙ্গ জাতীয় সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথ একটি ইঙ্গ-বঙ্গ জাতীয় সঙ্গীতের নমুনা দিয়াছেন :—

"মা এবার মলে সাহেব হব ;
রাঙা চুলে হ্যাট্ বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব !
শাদা হাতে হাত দিয়ে মা বাগানে বেড়াতে যাব,
(আবার) কালো বদন দেখ্‌লে পরে 'ব্লাকি' বোলে মুখ ফেরাব !"[২]

আত্ম সম্মান রক্ষা

"আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, ভবিষ্যতে যেসকল বাঙ্গালীরা বিলাতে আস্‌বেন, তাঁরা, যেন আমার এই পত্রটি পাঠ করেন। বাঙ্গালীদের নামে যথেষ্ট কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাঁরা যেন সে কলঙ্ক আর না বাড়ান, তাঁরা যেন সে কলঙ্ক এ সাত-সমুদ্র-পারে আর রাষ্ট্র না করেন। জন্মে অবধি শত শত নিন্দা গ্লানি অপমান নতশিরে সহ্য কোরে আস্‌চি, এই দূর-দেশে এসে একটু মাথা তোল্‌বার অবকাশ পাওয়া যায়, এখানকার লোকেরা আমাদের অনেকটা সমান ভাবে ব্যবহার করে বোলেই আমাদের পদাঘাতজর্জরিত মন একটু বল পেয়ে আত্মনির্ভরতা স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রভৃতি অনেকগুলি পৌরুষিক গুণ শিক্ষা কর্‌বার সুবিধা পায় ; কিন্তু এখানেও দলে দলে এসে তোমরা যদি হীন ও নীচ ব্যবহার কোর্‌তে আরম্ভ কর, এখানকার লোকের মনেও বাঙ্গালীদের ওপর ঘৃণা জন্মিয়ে দেও, তা' হলে এখানেও তোমাদের কপালে সেই উপেক্ষা, সেই নিদারুণ ঘৃণা আছে।..... বিলাতের কুহকগুলি আগে থাকতে তোমাদের চক্ষে ধোর্‌লেম, যখন বিলাতে আসবে, তখন সাবধানে পদক্ষেপ কোরো। ইঙ্গ-বঙ্গদের দোষগুলিই আমি বিস্তৃত কোরে বর্ণনা কোর্‌লেম, কেন না লোকে গুণের চেয়ে দোষগুলিই অতি শীঘ্র ও সহজে অনুকরণ করে!"[৩]

১। য়ুরোপ-প্রবাসী, (৫ম পত্র, ৯২-৯৩) ভারতী ১২৮৯, আশ্বিন, ২৫৬।

২। য়ুরোপ-প্রবাসী, (৫ম পত্র, ৯২) ভারতী ১২৮৬, আশ্বিন, ২৫৭ পৃঃ।

৩। য়ুরোপ-প্রবাসী (৫ম পত্র, ১০৩ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, আশ্বিন, ২৬১ পৃঃ।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের স্বভাব

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত পড়িলে বাল্যকাল হইতে তাঁহার আত্ম-সম্মান-বোধ কিরকম উজ্জ্বল ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"আমাদের জাহাজে একটি আস্ত জন্‌বুল ছিলেন ·····প্রত্যহ সকালে উঠেই শুন্‌তে পেতেম তিনি ইংরিজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের চাকর-বাকরদের অজস্র গাল দিতে আরম্ভ কোরেছেন, ও দশদিকে দাপাদাপি কোরে বেড়াচ্চেন। তাঁকে কখনো হাস্‌তে দেখি নি; কারো সঙ্গে কথা নেই বার্তা নেই; আপনার ক্যাবিনে গোঁ হোয়ে বসে আছেন। কোন কোন দিন ডেকে বেড়াতে আস্‌তেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপা-কটাক্ষে নেত্রপাত কর্‌তেন, তাকে যেন পিঁপ্‌ড়াটির মত মনে কর্‌তেন।·····তাঁর তালবৃক্ষের মত শরীর, ঝাঁটার মত গোঁফ, সজারুর কাঁটার মত চুল, হাঁড়ির মত মুখ, মাছের চোকের মত ভাববিহীন ম্যাড়্‌মেড়ে চোক, তাঁকে দেখলেই আমার গা কেমন করত, আমি পাঁচ হাত তফাতে সোরে যেতাম।"[১]

"·····জাহাজে ইংরেজদের সঙ্গে মেশা বড় হোয়ে উঠে না। যে সাহেবেরা তখন জাহাজে থাকেন, তাঁরা টাটকা ভারতবর্ষ থেকে আস্‌চেন, সেই 'হজুর, ধর্মাবতার'গণ কৃষ্ণবর্ণ দেখলে নাক তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে চোলে যান, ও এই ঘোরতর তাচ্ছিল্যের স্পষ্ট লক্ষণগুলি সর্বাঙ্গে প্রকাশ কোরে কৃষ্ণবর্ণের মনে দারুণ বিভীষিকা সঞ্চার কোরেছেন জেনে মনে মনে পরম সন্তোষ উপভোগ করেন। ·····এখানকার গলিতে গলিতে যে 'জন, জোন্স, টমাস্'গণ কিলবিল কোর্‌চে যাদের মা, বাপ, বোনকে, একটা কসাই, একটা দর্‌জী ও একজন কয়লাবিক্রেতা ছাড়া আর কেউ চেনে না, তারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে পদার্পণ করে, সে অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হোয়ে যায়, যে রাস্তায় তাঁরা চাবুক হস্তে ঘোড়ার চড়ে যায় (হয়ত সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্যই ব্যবহার হয় না) সে রাস্তাসুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হোয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তাদের একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক-একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে উঠে, এ রকম অবস্থায় সে ভেকদের পেট উত্তরোত্তর ফুলতে ফুলতে যে হস্তীর আকার ধারণ কোর্‌বে, আমি ত তাতে বিশেষ

১। য়ুরোপ-প্রবাসী, (১ম পত্র, ১১ পৃঃ) ভারতী ১২৮৮, বৈশাখ, ৪৭ পৃঃ।

অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাইনে। তারা রক্ত-মাংসের মানুষ বৈ ত নয়, যে দেশেই দেখ না কেন, ক্ষুদ্র যখনি মহান্‌পদ পায়, তখনি সে চোক রাঙিয়ে, বুক ফুলিয়ে মহত্বের একটা আড়ম্বর, আস্ফালন করতে থাকে; এর অর্থ আর কিছু নয় তারা মহত্বের শিক্ষা পায়নি।[১]

".....উদ্ধত, গর্বিত, বিকৃত, নীচ-স্বভাব অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানরা আমাদের যে রকম নীচু নজরে দেখে,...তাতে বিশেষ কি এল গেল? স্ত্রী পুত্র পরিবার সমেত লাঙ্গুল নাড়তে নাড়তে একটা গর্ব্ব-স্ফীত অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানের পা চাট্‌তে যাবার প্রয়োজন কি?[২]

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই এইরূপ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌দের নিকট হইতে সহস্র হস্ত দূরে থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

ভদ্র ইংরেজ

কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি কখনো মনে করেন নাই যে ইংরেজ মাত্রই অভদ্র :—

"মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরেজ দেখ্‌তে পাবে, তাঁরা হয়ত তোমাকে নিতান্ত সঙ্গীহীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশ্‌তে চেষ্টা কোর্‌বেন্, জান্‌বে তাঁরা যথার্থ ভদ্র, অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক, বংশাবলীক্রমে তাঁরা ভদ্রতার বীজ পেয়ে আস্‌চেন, তাঁরা এখানকার কোনো অজ্ঞাতকুল থেকে অখ্যাত নাম নিয়ে ভারতবর্ষে গিয়ে হঠাৎ ফেঁপে ফুলে ফেটে আট-খানা হোয়ে পড়েন নি।"[৩]

"ভদ্র ইংরেজদের দেখ, তাঁদের কি সুন্দর মন! মাঝে মাঝে এক একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা আংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের ঘোরতর সংক্রামকরোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও উদ্ধত গর্বিত হয়ে উঠেন না। সমাজশৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে, সহস্র সহস্র সেবকের দ্বারা বেষ্টিত হোয়ে ভারতবর্ষে থাকা, উন্নত ও ভদ্র মনের এক অগ্নিপরীক্ষা"[৪]

১। য়ুরোপ-প্রবাসী, (৫ম পত্র, ৬৭-৬৮ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬ ভাদ্র, ২১৯ পৃঃ।

২। য়ুরোপ-প্রবাসী, (১০ম পত্র, ২৩৩ পৃঃ) ভারতী ১২৮৭, বৈশাখ, ৩৬-৩৭ পৃঃ।

৩। য়ুরোপ-প্রবাসী, (৫ম পত্র, ৬৭ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬ ভাদ্র, ২১৯ পৃঃ।

৪। য়ুরোপ-প্রবাসী (৫ম পত্র, ৬৮ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, ভাদ্র, ২১৯ পৃঃ।

বিলাতের ছাত্র

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়া ব্রাইটনে একটি পাব্লিক স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। সহপ ঠীছাত্রদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"ব্রাইটনের এই স্কুলের একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম—ছাত্রেরা আমার সঙ্গে কিছুমাত্র রূঢ় ব্যবহার করে নাই। অনেক সময়ে তাহারা আমার পকেটের মধ্যে কমলালেবু আপেল প্রভৃতি ফল গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী বলিয়াই আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ আচরণ ইহাই আমার বিশ্বাস।"[১]

বিলাতের শিক্ষক

"একজন আমাকে লাটিন শিখাইতে আসিতেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা—গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায়—শীতকালের নগ্ন গাছগুলার মতই তিনি যেন আপনাকে শীতের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন না তিনি যে আপন বয়সের চেয়ে বুড়া হইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। ....একটা মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন পৃথিবীতে এক একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানব-সমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, কিন্তু হাওয়াটা একই। পরস্পরের দেখাদেখি যে একই ভাব ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে, যেখানে দেখাদেখি নাই সেখানেও অন্যথা হয় না। এই মতটিকে প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কেবলি তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন ও লিখিতেছেন। এদিকে ঘরে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই।...এক একদিন আমাকে পড়াইবার সময় তিনি যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেন না, লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। ....সেদিন পড়ানোর পদে পদে বাধা ঘটিত, চোখ দুটো কোন্ শূন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিত, মনটাকে কোনো মতেই প্রথম পাঠ্য লাটিন ব্যাকরণের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেন না। এই ভাবের ভারে ও লেখার দায়ে অবনত অনশনক্লিষ্ট লোকটিকে দেখিলে আমার বড়ই বেদনা বোধ হইত। যদিও বেশ বুঝিয়াছিলাম ইঁহার দ্বারা

১। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮. চৈত্র, ৫৩৫ পৃঃ।

আমার পড়ার সাহায্য প্রায় কিছুই হইবে না—তবুও কোনো মতেই ইঁহাকে বিদায় করিতে আমার মন সরিল না। যে কয়দিন সে বাসায় ছিলাম এমনি করিয়া লাটিন পড়িবার ছল করিয়াই কাটিল। বিদায় লইবার সময় যখন তাঁহার বেতন চুকাইতে গেলাম তিনি করুণস্বরে আমাকে কহিলেন—আমি কেবল তোমার সময় নষ্ট করিয়াছি, আমি ত কোনো কাজই করি নাই; আমি তোমার কাছ হইতে বেতন লইতে পারিব না। আমি তাঁহাকে অনেক কষ্টে বেতন লইতে রাজি করিয়াছিলাম। আমার সেই লাটিন শিক্ষক যদিচ তাঁহার মতকে আমার সমক্ষে প্রমাণসহ উপস্থিত করেন নাই তবু তাঁহার সে কথা আমি এ পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করি না। এখনো আমার এই বিশ্বাস যে, সমস্ত মানুষের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে; তাঁহার এক-জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।"[১]

বিলাতের গৃহিণী

"এবারে ডাক্তার স্কট্ নামে একজন ভদ্রগৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল। ...অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মত হইয়া গেলাম। মিসেস্ স্কট আমাকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ। এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করিয়াছি—মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে আমাদের দেশে পতিভক্তির একটি বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস্ স্কটের আমি ত বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চাকরবাকরদের উপসর্গ নাই, প্রায় সব কাজই নিজের হাতে করিতে হয়, এইজন্য স্বামীর প্রত্যেক ছোটখাটো কাজটিও মিসেস্ স্কট নিজের হাতে করিতেন। ....গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গান বাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদপ্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর

১। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, চৈত্র, ৫৫৬ পৃঃ।

কর্তব্যেরই অঙ্গ। ···এই সমস্তের মধ্যে একটা জিনিষ দেখিতে পাইতাম, সেটি স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি। তাঁহার সেই আত্মবিসর্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই সেখানে তাহা আপনিই পূজায় আসিয়া ঠেকে।" কিছুদিন পরে দেশে ফিরিবার সময় হইল। "বিদায় গ্রহণ কালে মিসেস স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে? —লণ্ডনে এই গৃহটি আর এখন নাই—এই ডাক্তার-পরিবারের কেহ বা পরলোকে, কেহ বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার কোনো সংবাদই জানি না, কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।"[১]

বিলাতের মানুষ

প্রথমবার বিলাতে অবস্থান কালের আরো দুই একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

"একবার শীতের সময় আমি···দেখিলাম একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই. বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোন কথা বলিল না, কেবল মুহূর্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছুদূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, মহাশয়, আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন বলিয়া মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। এই ঘটনাটি হয়ত আমার মনে থাকিত না, কিন্তু ইহার অনুরূপ আর-একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি ষ্টেসনে প্রথমে যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকা গাড়িতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনীজাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্দ্ধ ক্রাউন ছিল সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্বোধ

১। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩১৮, চৈত্র ৫৩৭ পৃঃ।

বিদেশী ঠাহরাইয়া আরো কিছু দাবি করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, আপনি বোধ করি পেনী মনে করিয়া আমাকে অর্দ্ধক্রাউন দিয়াছেন।"

"যতদিন ইংলণ্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বঞ্চনা করে নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাখিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড় করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে। আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না তাহারাই অন্যকে বিশ্বাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশী অপরিচিত, যখন খুসি ফাঁকি দিয়া দৌড় মারিতে পারি—তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমাদিগকে সন্দেহ করে নাই।"[১]

রবীন্দ্রনাথ আঠারো বৎসর বয়সে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

বিলাত যাত্রার সার্থকতা

রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত স্বল্প বয়সেই বিলাত গিয়াছিলেন। অল্প বয়সের অভিজ্ঞতা মনের উপর যেরূপ দাগ রাখিয়া যায়, বেশি বয়সে আর সেরূপ ঘটে না। এইজন্য প্রথম বারের বিলাত যাওয়ার কথা আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ বিলাতি বাহ্য চাকচিক্যে আদৌ মুগ্ধ হন নাই, বরঞ্চ প্রথমে কতক পরিমাণে নিরাশ হইয়াছিলেন। বিলাতি আচার-ব্যবহারের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ জন্মে নাই, এমন কি তিনি তাঁহার দেশী কাপড় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন না। বিলাতি চালচলনের নকল করা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; ইঙ্গবঙ্গদের সাহেবিয়ানাকে জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ মনে করিয়া তিনি তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কিছুদিন বিলাতে অবস্থান করিবার পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বিলাতের সামাজিক স্বাধীনতা একটি মূল্যবান জিনিষ। স্ত্রীস্বাধীনতার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া দেশীয় সমাজে তাহা প্রচলন করিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। দেশীয় সমাজের প্রতি প্রবল অনুরাগ সত্ত্বেও বিদেশী সমাজের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা গ্রহণ করিতে তিনি বাধা বোধ করেন নাই।

১। জীবন-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩ ৮, চৈত্র, ৫৬৮ পৃঃ।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের উদ্ধত ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই, অভদ্র ইংরেজের গর্ব্বিত হাবভাব তাঁহার আত্মসম্মানবোধকে পীড়িত করিয়াছে তিনি নিজে তাহাদের নিকটসম্পর্ক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে সহস্র হস্ত দূরে থাকিবার জন্য বাঙ্গালী যুবকগণকে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ বিদ্বেষী হইয়া উঠেন নাই। ভদ্র ইংরেজের মহত্ব তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়া ছিলেন। দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট অকালবৃদ্ধ লাটিন-শিক্ষকের ভাব-পীড়িত করুণ মুখচ্ছবি, ব্রাইটনে সহপাঠিদের গোপন সহানুভূতি, জীর্ণচীর ভিক্ষুক ও সামান্য মুটের সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতা, আত্মবিসর্জনতৎপরা পতিব্রতা মিসেস্ স্কটের নম্র মাধুর্য্য ও সস্নেহ বাৎসল্য রবীন্দ্রনাথের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের যোগাযোগের দ্বারা, এবং ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মাধুর্য্য দ্বারা সভ্যতার মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেন—ইহাই বিলাতগমনের সর্বপ্রধান সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে মানুষের প্রকৃতি সব জায়গায়ই সমান, তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে। ইংলণ্ডে না গেলে অত অল্প বয়সে একথা তিনি এমন করিয়া বুঝিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

য়ুরোপের উপকরণবাহুল্য ও কর্মব্যবস্থার জটিলতা।

অল্প বয়সের আর একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। য়ুরোপে পৌঁছিয়াই সেখানকার উপকরণবাহুল্য ও কর্মব্যবস্থার জটিলতা রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়িল।

"সকালবেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছিলেম। কি জমকালো সহর! সেই অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পোড়্‌লে অভিভূত হোয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। আমার মনে হোলো, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কি আবশ্যক! একটা হোটেলে গেলেম, তার সমস্ত এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড, যে, ঢিলে কাপড় পোরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলে থাকতে গেলেও আমার বোধ হয় তেমনি অসোয়াস্তি হয়। একটা ঘরের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে যাই তার ঠিক নেই। স্মরণ-স্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে-বাঁধানো

রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জনকোলাহল প্রভৃতি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।"[১]

য়ুরোপের এই উপকরণ-বাহুল্য তাঁহার মনকে চিরদিনই পীড়া দিয়াছে—আধুনিক কালের লেখার মধ্যে সর্বত্রই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সতেরো বৎসর বয়সে য়ুরোপের বাহ্যাড়ম্বরের বিড়ম্বনা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

"ইংলণ্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে কি পড়ে জান, লোকের ব্যস্তভাব। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখ্‌তে মজা আছে—বগলে ছাতি নিয়ে হুস্ হুস্ কোরে চোলেছে, পাশের লোকের উপর ভ্রুক্ষেপ নেই, মুখে ব্যস্তভাব প্রকাশ পাচ্চে—সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। ইংলণ্ডে যে কত রেলোয়ে আছে তার ঠিকানা নেই, সমস্ত লণ্ডনময় রেলোয়ে—প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর এক একটা ট্রেন যাচ্চে। একটা রেলোয়ে-ষ্টেশনে গেলে দেখা যায়, পাশাপাশি যে কতশত লাইন রোয়েছে তার ঠিক নেই। লণ্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার সময় দেখি, প্রতিমুহূর্ত্তে উপর দিয়ে একটা, নীচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারিদিক থেকে হুস্ হুস্ করে ট্রেন ছুটেছে—সে ট্রেনগুলোর চেহারা দেখলে আমার লণ্ডনের লোক মনে পড়ে—এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস কর্‌তে কর্‌তে চোলেছে, একতিল সময় নষ্ট কোর্‌লে চলে না! দেশ ত এই এক রত্তি, নোড়ে চোড়ে বেড়াবার জায়গা নেই, দুপা চোল্লেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাইনে।"[২]

বিলাত আসিবার পূর্বেই পনেরো-ষোল বৎসর বয়সে তিনি লিখিয়াছিলেন যে দারিদ্র্য দূর করা আবশ্যক, কিন্তু অত্যধিক অর্থে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

"অর্থ···ইংরেজদের কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অর্থ তোমার সহায়তা করে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত হইলেই আবার জ্ঞানের শত্রুতাচরণ করে; বিলাস মনকে এমন নিস্তেজ করিয়া ফেলে যে জ্ঞানের শ্রমসাধ্য আলোচনায় অক্ষম হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে বিলাস-স্রোত যেরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ইংলণ্ডের সভ্যতা যে শীঘ্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি।"[৩]

১। য়ুরোপ-প্রবাসী, (১ম পত্র, ২৩ পৃঃ,) ভারতী, ১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ, ৯২ পৃঃ।

২। য়ুরোপ-প্রবাসী (২য় পত্র, ৩২ পৃঃ) ভারতী ১২৮৬, আষাঢ়, ১২১-১২২ পৃঃ।

৩। "বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য', ভারতী, ১২৮৫, মাঘ, ৩০৯ পৃঃ।

শৈশব-রচনা

কাব্য-সাহিত্য

এইবার ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত লেখা শৈশব-কবিতার পরিচয় দিয়া পরে এই সময়ের গদ্যসাহিত্যের আলোচনা করিব।

কবিতা রচনারম্ভ

সাত আট বৎসর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। জীবন-স্মৃতিতে আছে :—

"আমার বয়স তখন সাত আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়।....আমার মত শিশুকে কবিতা লিখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুর বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। বলিয়া পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযে'গের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

"পদ্য জিনিসটিকে এপর্য্যন্ত ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবাচিন্তা নাই, কোনোখানে মর্ত্যজনোচিত দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না।.....গোটা কয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল, তখন পদ্য রচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না।"

"ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে? কোনো একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড় বড় কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে সুরু করিয়া দিলাম।.....কাব্যগ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারি হয় নাই। কবিতা কবির জামার পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, এই তিনে-এক একে-তিন হইয়া ছিলাম।"[১]

১। জীবন-স্মৃতি, (২৪-২৫ পৃঃ) প্রবাসী, ১৩১৮, আশ্বিন, ৫৯৫-৫৯৯ পৃঃ।

জীবন-স্মৃতিতে কবি বাল্যকালে কাব্যচর্চা সম্বন্ধে সকৌতুক বর্ণনা করিয়াছেন—

"সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মত ভরিয়া উঠিতে চলিল। বালকের আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল হাতের পীড়নে প্রথমে তাহা কুঞ্চিত হইয়া গেল। ক্রমে তাহার ধারগুলি ছিঁড়িয়া কতকগুলি আঙুলের মত হইয়া ভিতরের লেখাগুলিকে যেন মুঠা করিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিল। সেই নীল ফুলস্ক্যাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তদেবী কবে বৈতরণীর কোন ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা, তাহার ভবভয় আর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের জঠর-যন্ত্রণার হাত সে এড়াইল।"[১]

এই সময়কার কবিতার দুয়েকটি নমুনাও কবি দিয়াছেন।[২] বাল্যকালে "ঈশ্বর"-স্তব রচনাও বাদ পড়ে নাই, তাহাতে যথারীতি দুঃখকল্প ও ভবযন্ত্রণার উল্লেখ ছিল।[৩]

কাব্য-চর্চ্চা

যাহা হউক কাব্য-চর্চা চলিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বার তেরো বছর তখনকার কথা লিখিয়াছেন—

"বাড়ীর লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিকে আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার, না আর কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন-মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।[৪]

রচনা প্রকাশ

আর দু-এক বছরের মধ্যেই ১২৮২ সালে রচনা প্রকাশ প্রথম আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর।

"এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনাআপনির মধ্যেই

১। জীবন-স্মৃতি, (৩৪ পৃঃ), প্রবাসী, ১৩১৮, কার্ত্তিক, ২ পৃঃ।

২। জীবন-স্মৃতি (৩৪-৩৫ পৃঃ), প্রবাসী, ১৩১৮, কার্ত্তিক, ৩ পৃঃ।

৩। জীবন-স্মৃতি (৩৮-৩৯ পৃঃ), প্রবাসী, ১৩১৮, কার্ত্তিক, ৪-৫ পৃঃ।

৪। জীবন-স্মৃতি (৯৩ পৃঃ), প্রবাসী, ১৩১৮, ফাল্গুন, ৪১৩ পৃঃ।

বন্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে সুরু করিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোন্‌দিন তাহাদের তলব পড়িবে, এবং কোন্ উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।"[১]

এই জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে (অগ্রহায়ণ, ১২৮২—কার্তিক ১২৮৩) কবিতায় "বনফুল" ও "প্রলাপ" এবং গদ্যে "ভুবন মোহিনী প্রতিভা"র সমালোচনা বাহির হইয়াছিল।

বনফুল নামে কবিতার উপন্যাসখানি ছয় সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছিল।[২] তিন বৎসর পরে ১২৮৬ সালে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১। জীবন-স্মৃতি, (৯৬ পৃঃ) প্রবাসী, ১৩১৮, ফাল্গুন, ৪১৪-৪১৫ পৃঃ

২। জ্ঞানাঙ্কুর, ৪র্থ খণ্ড, ১২৮১—১২৮০।